Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 129-135
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মূল্যবোধে লোকসংগ্রহ'র পূর্বশর্ত অহিংসা : একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

সৈরথ মুখার্জী
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The literal meaning of 'value' is 'worth', profit, utility, advantage, benefit etc. The term value is used in different senses in different subjects, as, for example, in economics value means price, in ethics value denotes the moral worth of voluntary human actions. Value is thus one of the main pillars of society and state. Lokasaṁgraha is a well-known conception of the Śrīmadbhagavadgītā. The Sanskrit phrase 'lokasaṁgraha' is the conjunction of two words like 'loka' and 'saṁgraha'. 'loka' means the people; 'sangraha' means their holding or combining collectively, their living in synchronization. The literal meaning of the term lokasaṁgraha is 'universal welfare' or 'universal protection of the people' or 'the welfare of the world' or 'world defence'. The Sanskrit phrase 'ahiṃsā' means 'non-injury' or 'non-killing', or 'non-violence'. The concept of ahiṃsā finds occurance in the Ṛgveda, different upaniṣads like Chāndogya, Śāṇḍilya etc., the Rāmāyana, the Mahābhārata, the Śrīmadbhagavadgītā, Pātañjala-yoga, Jainism, Buddhism, and finally we get a new look of it in Mahatma Gandhi's thought. Lokasaṁgraha is one of the paths of morality. Any kind of obstruction-free establishment of the welfare of the world or universal philanthropy and world happiness is called lokasaṁgraha. Lokasaṁgraha is a goal and ahiṃsā is its means to attain this achievement. The practice of non-violent action is absolutely essential for the establishment of the lokasaṁgraha or the universal protection of the people. Lokasaṁgraha or universal philanthropic actions can never happen in the absence of non-violent actions. Attempt will be made in this paper to make a suitable analytical discussion on the issue: how these two Indian philosophical concepts—lokasaṁgraha and ahiṃsā—are complementary, i.e. how can ahiṃsā or non-violence be essential prerequisite or necessary condition of lokasaṃgraha to the creation of social unity or peaceful society.

Key Words: Value, Lokasaṁgraha, Welfare, Philanthropy, Ahiṃsā.

'Value' শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল 'মূল্য' বা 'দাম' বা 'লাভ' বা 'উপযোগিতা' বা 'সুবিধা' ইত্যাদি। অর্থনীতির ভাষায় 'মূল্য' শব্দের দ্বারা কোন কিছুর দর বা দাম'কে বোঝানো হয়। আবার নীতিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, শিক্ষাবিদ্যা ইত্যাদির ভাষায় 'Value' শব্দের দ্বারা 'মূল্যবোধ'কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে 'Value' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল 'মূল্যবোধ'। কোন কাজকে যথোচিত-অনুচিত, অকল্যাণ-বাধ্যবাধকতা, ভাল-মন্দ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ ইত্যাদির দ্বারা বিচার বা নির্ণয় করার যে বোধ বা সামর্থ্য তাকে মূল্যবোধ বলে। অর্থাৎ যথোচিত কে

যথোচিত বলে জেনে তার সমর্থন এবং অনুচিতকে অনুচিত বলে জেনে তার প্রত্যাখ্যান ব্যক্তি যে বোধ বা সামর্থ্য থেকে করে তাই হল মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানী R.T. Schaefer তাঁর 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Values are collective conceptions of what is considered good, desirable or proper - or bad, Undesirable and improper in a culture."[১] "অর্থাৎ ভাল বা মন্দ, কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিত এবং যথোচিত বা অনুচিত সম্পর্কে সমাজোস্থিত ধারণাই হল মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানী David Popenoe তাঁর 'Sociology' গ্রন্থে মূল্যবোধ কি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন "Value is 'an idea shared by the people in a society' about what is 'good and bad', 'right and wrong', 'desirable and undesirable'."[২] অর্থাৎ ভাল-মন্দ, যথোচিত-অনুচিত কাম্য-অকাম্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে বোধ তাই হল মূল্যবোধ। অধ্যাপক লিলি'র মতে মূল্য, বাধ্যবাধকতা, নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ও বিষয়গত বৈধতা এই চারটি বিষয়ের দ্বারা কোন কাজ ভাল বা মন্দ কিনা তা বিচার করা হয়। এক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি হল মূল্য-নিরূপক শব্দ যার দ্বারা কাজের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয় করা হয়। মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তনশীল, তাই স্থান কাল পাত্রভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রদর্শিত হয়। মূল্যবোধ হলো এমন কিছু রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে। মানুষের সামাজিক আচার-আচারণ নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড হল মূল্যবোধ। সমাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি হল সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে নীতি-নৈতিকতার এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমাজে আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন রূপে কাজ করে। তাই বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম মূল ভিত্তি হল মূল্যবোধ। এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল, মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দর্শনে লোকসংগ্রহ ও আহিংসা'র মূল্যবোধ কি ভাবে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য বা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে একে অপরের পরিপূরক হয়ে সহায়তা করে বা সমাজে লোকসংগ্রহমূলক কর্মের অমুষ্ঠানে লোকসংগ্রহ'র অপরিহার্য পূর্বশর্ত যে অহিংসা তা প্রদর্শন করা।

'লোকসংগ্রহ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'বিশ্বরক্ষা' বা 'সৃষ্টিরক্ষা' বা 'লোকরক্ষা'। সৃষ্টি-কার্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, তার সহায়ক হয়ে সৃষ্টি কার্যকে সুরক্ষিত রাখাই হল লোকসংগ্রহ। সামাজিক ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে লোকসংগ্রহ তত্ত্ব খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। নৈতিকতা, বিশ্বজনের কল্যাণ ও সুখ প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হল লোকসংগ্রহ। জগতের প্রতিটি প্রাণীর রক্ষণ ও ভরণ-পোষনের দায়িত্ব যেহেতু মানুষের উপর সেহেতু নিজ নিজ বর্ণ ও আদর্শের দ্বারা কামনাশূন্য হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের সাথে সাথে অপরকে দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে নিযুক্ত করাই হল লোকসংগ্রহ।

'লোকসংগ্রহ' শব্দটি আমরা বহুপূর্বে ম*হাভারতে*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* লক্ষ্য করি। পরবর্তীকালে *মনুসংহিতায়* 'রাষ্ট্রসংগ্রহ'[৩] শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, যা প্রকৃতপক্ষে লোকসংগ্রহ'রই নামান্তর। এছাড়াও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*'র উপর যে সমস্ত ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেই গ্রন্থগুলিতে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা লোকসংগ্রহ'র ধারণা পাই।

মহাভারতের শান্তিপর্বের সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়ের ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

রাজ্ঞো রহস্যং যদ্বাক্যং জয়ার্থং লোকসংগ্রহ।।
হৃদি যচ্চাস্য জিহ্মং স্যাৎ কারণেন চ যদ্ভবেৎ।।১৯।।[৪]
যচ্চাস্য কার্য্যং বৃজিনমার্জবেনেহ নির্জয়েৎ।।
দম্ভনার্থঞ্চ লোকস্যধর্ম্মিষ্ঠামাচরেৎ ক্রিয়াম্।।২০।।[৫]

অর্থাৎ যুদ্ধে জয় লাভ করার জন্য বা মূলত লোকসংগ্রহের জন্য রাজার কর্তৃক যা কিছু আয়োজন, কূটাভিসন্ধি এবং যে সকল অন্যায় কাজ করা হয়ে থাকে সেই সকল বিষয়ই সাধারণ লোকের কাছে গোপন রাখবেন এবং নিজের সরলতা প্রকাশ করবেন। আর তিনি লোকমত সংগ্রহ করিবার জন্য ধর্ম্ম কার্য্য করবেন।
লোকসংগ্রহ হল *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*'র একটি সুবিদিত ধারণা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*'র তৃতীয় অধ্যায়ের ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।(৩/২০)[৬]

কর্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান যে শ্রেয় তাই গীতার এই শ্লোকটির মাধ্যমে মূলত প্রকাশ করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে দৃষ্টান্তের সাহায্যে অর্জুন কে তার স্বধর্মে(যুদ্ধ) অবগত করতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জনকাদি (রাজা জনক, অশ্বপতি, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, ইক্ষ্বাকু প্রমুখ মহাপুরুষগণ) ফল-আকাঙ্খা বর্জিত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কামনা শূন্য হয়ে কর্ম্ম কর।

> "শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধর্ম্মে বা নিজ ধর্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি সৎ কর্ম করলে সকলে কর্ম সৎ করবে, আর আমি সৎ কর্ম না করলে অজ্ঞরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন স্করে তার দ্বারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করাচার্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি বা অপরাধ বা অন্যায়াচরণের নিবৃত্তি বা নিবারণই হল লোকসংগ্রহ।"[৭]

এই শ্লোকটির মধ্যে 'লোকসংগ্রহ' শব্দটির অন্তর্গত 'লোক' শব্দটির দ্বারা মনুষ্যলোক অতিরিক্ত দেবাদি সমস্ত লোকের উল্লেখ করার সাথে সাথে এই বানীও প্রচারিত হয়েছে যে প্রতিটি লোক প্রতিটি লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর বা কল্যাণকর এমন কর্মই সম্পাদন করবে। *ভগবদ্গীতায়* 'লোকসংগ্রহ' পদটির দ্বারা এই ব্যাপক অর্থটিই পরিস্ফুটিত হয়েছে। লোকসংগ্রহের এই অর্থের দ্বারা প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালিত হলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র পক্ষে অকল্যাণকর এমন কাজে লিপ্ত হবে না। এর ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজব্যবস্থা যেমন সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিত্রসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংগ্রহ সমাজের যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন রূপে কাজ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,

সক্তাঃ কর্মন্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।(৩/২৫)[৮]

এই শ্লোকটির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, হে ভারত, অজ্ঞেরা কর্মাসক্ত হয়ে যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণও আসক্তিবর্জিত হয়ে লোকসংগ্রহার্থে বা লোকরক্ষার্থের জন্য সেরূপ কর্ম করা উচিত। যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা তাই অনুসরণ করে। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বা কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষ তাকে অনুসরণ তারই অনুবর্তন করে। সুতরাং অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি জ্ঞানী ব্যক্তির আচার-আচরণ, কর্ম ইত্যাদি কে অনুসরণ ক'রে চলে তাহলে তাদের কর্ম ও আচার-আচরণও হয়ে উঠবে লোকসংগ্রহার্থক কর্মের বা বিশ্বরক্ষামূলক কর্মের অনুরূপ। ফলে সামাজিক ঐক্য ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

আবার সকলকে একটা সৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা, তাদের শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের রক্ষা ও উন্নতিসাধন করাকেও বলা হয় 'লোকসংগ্রহ'। এইদিক দিয়ে বিচার করলে যোগের অনুশীলন ও তার দ্বারা অপরকে প্রভাবিত করাও একপ্রকার লোকসংগ্রহমূলক কাজ। এছাড়াও আর্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্যগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, রক্তদান শিবির ইত্যাদি সবই হল লোকসংগ্রহমূলক ক্রিয়া। এই হল লোকসংগ্রহের সামাজিক মূল্য।

লোকসংগ্রহের যে কেবল সামাজিক ও নৈতিক মূল্য আছে তা নয়, এইসব মূল্যের অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক মূল্যটি অতি গভীর ও ব্যাপক। কেবল সামাজিক কর্তব্য পালন ইত্যাদি নৈতিক কর্ম উপদেশই লোকসংগ্রহের মূলকথা নয়। "*গীতায়* কর্মযোগের উদ্দেশ্যে জীবলোককে ভাগবদ-জীবনের আদর্শ দেখিয়ে ভাগবদ-ধর্মী করা, যেন কর্ম করতে করতেই সেই শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে কৃতার্থ হতে পারে" এই হল লোকসংগ্রহের গূঢ় অর্থ। গীতায় বলা হয়েছে,

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।(১৮/৪৬)[৯]

অর্থাৎ যাঁহা (পরমেশ্বর) থেকে সকল ভূতের বা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরম করুণাময়'কে মানুষ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত যথাযথ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।

'অহিংসা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ক্ষতি বা দ্বেষ বা অনর্থ বা অপকার বা হিংসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। 'অহিংসা' শব্দটির মধ্যে 'অ' শব্দটি না সূচক উপসর্গ হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে আর 'হিংসা' শব্দের দ্বারা 'ক্ষতি' বা 'দ্বেষ' বা 'আঘাত' করাকে বোঝানো হয়। সুতরাং কাউকে আঘাত না করা বা কারো ক্ষতি সাধন না করা বা ক্ষতিকর কথা না বলাই হল অহিংসা। এই হল অহিংসা শব্দের সাধারন অর্থ। যদিও এটি হল এটি হল অহিংসার নঞর্থক অর্থ। আর সদর্থক অর্থে অহিংসা হল সর্বজীবে প্রেম বিতরণ ও কল্যাণকর বা জীবের পক্ষে হিতকর এই সকল কর্মের অনুষ্ঠান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'অহিংসা' নামক উপন্যাসে অহিংসা ও প্রেম যে একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা ওপ্যনাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রদর্শিত করেছেন।[১০]

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে অহিংসার বানী প্রচারিত হয়ে আসছে। 'অহিংসা' শব্দটি আমরা বহু পূর্বে আমরা বিভিন্ন বেদে যেমন *ঋগ্বেদে, যজুর্বেদে;* বিভিন্ন *উপনিষদে* যেমন *ছান্দোগ্য উপনিষদে, শান্ডিল্য উপনিষদে; মহাভারতে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'য়, জৈন ও বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, মনুসংহিতা'য়* এবং সর্বশেষ অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে আমরা গান্ধীজির তত্ত্বালোচনায় পায়।

ঋগ্বেদে সর্বপ্রথম অহিংসা শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। *ঋগ্বেদে* বলা হয়েছে, 'অহিংসা' শব্দটি দেবতা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে[৯]। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশখন্ডের পঞ্চম মন্ত্রে জীবনকে যজ্ঞ রূপে উল্লেখ করে যজ্ঞের দক্ষিণার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে,

"তপো দানম্ আর্জবম্ অহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ"।।[১১] *(৩/১৭/৫)*

অর্থাৎ তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবাদীতা হল পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা। অর্থাৎ এই উপনিষদে দক্ষিণারূপে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে অহিংসা'কে জীবনের একটি নৈতিক আদর্শের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শান্ডিল্য উপনিষদে অহিংসা কে একপ্রকার বিরতি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারতে আদিপর্বে বলা হয়েছে,

অহিংসা পরমো ধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং বর।।[১২] *(১/১১/১৩)*

এই শ্লোকটিতে অহিংসা'কে পরম ধর্ম বলা হয়েছে।

বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রে যে পঞ্চশীলের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, 'পানং ন হানে'(পালিভাষা)[১৩] যার অপর একটি নাম হল 'প্রাণাতিপাত বিরতি' বা হত্যা থেকে বিরতি। 'হিংসা' শব্দটিকে অতি ব্যাপক অর্থে গ্রহন করে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন প্রকার প্রাণীকে কেবল হত্যা করা থেকে বিরত থাকায় অহিংসা নয়, এর সঙ্গে অনিষ্টমূলক কর্ম ও অনিষ্টমূলক কামনা থেকে দূরে থাকায় হল অহিংসা।

জৈন নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি হল অহিংসা। চব্বিশ তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এর দ্বারা অহিংসার বাণী এই ভাবে প্রচারিত হয়েছে,

> "আমি সকল জীবকে হত্যা করা থেকে নিরস্ত হব, সুক্ষ্ম বা স্থুল, চলমান বা অচল যাইহোক না কেন, আমি স্বীকার করব, কুফলের দায়িত্ব নেব, নিজেকে পাপ কর্ম থেকে মুক্ত করব।"[১৪]

অর্থাৎ জৈন নীতিদর্শনে 'অহিংসা'শব্দটিকে কঠোর অর্থে গ্রহণ করে বলা হয়েছে, কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি না করা, অহিতকর কথা না বলা এবং যে কোন প্রকার অকল্যাণমূলক চিন্তা থেকে বিরত থাকায় হল অহিংসা।অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক যেকোন প্রকার ক্রিয়া বা উপায়ের দ্বারা অপরের অকল্যাণ বা দুঃখ না জন্মানোই হল অহিংসা।

'যোগসূত্র' সূত্র গ্রন্থটিতে যোগের আটটি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ যম'র অন্তর্গত করে অহিংসার উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] *'যোগসূত্র'*-এ অহিংসার ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে "জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম"[১৫] অর্থাৎ এই অহিংসা সার্বভৌম মহাব্রত হতে পারে তখনই যখন তা জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা সীমিত না হয়ে সমস্ত বিষয়ে সকল প্রকারে বিচলিত থাকে। এই সার্বভৌম মহাব্রত যে যোগীর দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই যোগীর সন্নিধানে বা নিকটে অবস্থিত অন্যান্য সকল প্রাণীরই হিংসাবৃত্তি থাকে না। এ সম্পর্কে যোগসূত্রে বলা হয়েছে "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"[১৭]। যোগভাষ্যকার বেদব্যাস অহিংসার ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানাম্ অনভিদ্রোঃ অহিংসা"[১৮]। অর্থাৎ সর্বপ্রকারে, সর্বকালে সর্বপ্রকার প্রাণীর অভিদ্রোহ অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। আসলে অহিংসার ক্ষেত্রে নৈতিক যুক্তি এই যে, আমার প্রাণ যেমন অমার কাছে প্রিয়, অনুরূপভাবে অপরের প্রাণও তার নিজের কাছে প্রিয়। আমার প্রাণ যাতে হানী না ঘটে তার জন্য আমি যতটা যত্নবান হই, তোমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ আমার করা উচিত।

বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী সমাজবিদ্, রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিক মহাত্মা গান্ধী অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মৈত্রী-করুণা ও প্রেম-ভালবাসার সমাজের প্রত্যেক স্তরে কল্যাণ কর্ম করার কথা বলেছিলেন। গান্ধীজির মতে, কেবল শারীরিক বা দৈহিক নিপীড়নই হিংসা নয়, যে কোন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নকেও হিংসা বলা হয়। তাই এই সকল কর্ম থেকে বিরত থেকে মৈত্রী, করুণা, প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে সামাজিক ও নৈতিক কল্যাণ কর্ম সাধনই হল অহিংসা। গান্ধীজি অহিংসাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মূলত সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে, সমাজ গঠন ও সমাজ সংস্করণ এবং তার দ্বারা মন্দের স্বভাব পরিবর্তন ও তার চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে। গান্ধীজি এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে কেবল নাগরিকদের দমন করা নয়, যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হবে অহিংসার মন্ত্রে সকলকে জাগিয়ে তোলা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাব দিক থেকেই মানুষকে স্বাধীন করা। যেখানে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল অহিংসার অনুশীলনের দ্বারা চরিত্র বা চিত্তের শুদ্ধির দ্বারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা। সুতরাং অহিংসা'র ব্যাখ্যায় অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সঙ্গে গান্ধীজির মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
সুতরাং সুশৃঙ্খল সমাজ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অহিংসার সামাজিক মূল্যের ব্যপকতা অতি গভীর। নৈতিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অহিংসা চরিত্র সংশোধন ও চিত্তশুদ্ধিতে বিশেষ কর্যকরী ভূমিকা পালন করে। আর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে অহিংসা মোক্ষ লাভে সহায়িতা করে। তাই সমাজ সংস্করন, সমাজ গঠন, চরিত্র সংশোধন, চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষ লাভের উপায় রূপে অহিংসা হল অপরিহার্য আবশ্যিক শর্ত।

পরিশেষে একথাই বলতে হয় যে, যদিও মূল্যবোধ স্থান-কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে তবু অহিংসা ও লোকসংগ্রহের যে মূল্য তা স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে অভিন্ন রূপে সর্বজনীন হতে পারে। কেননা লোকসংগ্রহ'র দ্বারা বিশ্বরক্ষার জন্য সকলের কল্যানার্থে কর্ম করা হয় তেমনি অহিংসা'র দ্বারা স্থান-কাল পাত্র

ব্যতিরেকে সকলকে হিংসামূলক কর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়। উভয়ের দ্বারাই যেমন আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধিত হয়। কিন্তু একই প্রয়োজন সাধিত হলেও একের অনুপস্থিতে অপরটি কখনই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে অহিংসা ও লোকসংগ্রহ একে অপরের পরিপূরক। কেননা সকলের হিতার্থে লোকসংগ্রহ মূলক কর্ম করতে হলে অহিংসামূলক কর্মের অনুশীলন অত্যাবশ্যক। তাই বলতে হয় যে, অহিংসা হল লোকসংগ্রহের অপরিহার্য আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত। কোন কাজের বা ঘটনার আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত বলতে বোঝায়, এমন একটি ঘটনা বা পরিস্থিতি যার অনুপস্থিতিতে কর্যটি বা ঘটনাটি ঘটতে পারে না। অহিংসা হল লোকসংগ্রহের আবশ্যিক শর্ত। কেননা, অহিংসামূলক কর্মের অনুপস্থিতিতে লোকসংগ্রহমূলক কর্ম কখন ঘটতেই পারে না। তাই অহিংসা হল লোকসংগ্রহের অপরিহার্য আবশ্যিক শর্ত।

তথ্যসূত্র :

১। Schaefer, Richar, *Sociology*: A Brief Introduction,Edition, 5th. Boston, MA, 2004, p.77
২। David, Popenoe, *Sociology* (Englewood Cliffs: New Jersey, 1989), p.58
২। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৭/৫
৩। মনুসংহিতা,৭/১১৪
৪। মহাভারত শান্তি পর্ব অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ১৯
৫। মহাভারত শান্তি পর্ব অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ২০
৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/২০
৭। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৯
৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/২৫
৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮/৪৫
১০। ঋগ্বেদে ১০/২২/২৫
১১। ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ ৩/১৭/৫
১২। মহাভারত ১/১১/১৩
১৩। ধর্ম্মপদ, ২২৫
১৪। আয়ার, ২,৭,১,১, ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬১
১৫। যোগসূত্র, ২/২৯
১৬। যোগসূত্র ২/৩১
১৭। যোগসূত্র ২/৩৫
১৮। যোগভাষ্য, ২/৩০

গ্রন্থপঞ্জী :

আরণ্য, হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮।
গম্ভীরানন্দ, স্বামী, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।
গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারই, ২০০৭।
ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
ঘোষাল, চিত্তরঞ্জন, *উপনিষদ সংগ্রহ,* গ্রন্থিক প্রকাশন, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতীয় দর্শন,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, জয়ন্তী প্রেস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯০২।

জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* কলকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

তিলক, বালগঙ্গাধর (অনুবাদকঃ- শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য(বাংলা)*, কলকাতা, আদি ব্রহ্মসমাজ, ১৯২৪।

ন্যায়পঞ্চানন, যদুনাথ ও ভারতচন্দ্র শিরোমণি , *মনুসংহিতা*, কলকাতা, পাতুরিয়াঘাটা, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ (ভাদ্র, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ)।

পাল, বিপদভঞ্জন, *বেদান্তসার*, (অষ্টম সংস্করণ), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩।

বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অবিনাশ প্রেস, কলকাতা, ২০০০।

ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, *ভারতীয় দর্শন,* বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃলিঃ কলকাতা, ২০০৫।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, *মহাভারতম্* (খন্ড ৩৫) বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৩৮।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, *মহাভারতম্,* বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৩৮৩-১৪০০ বঙ্গাব্দ।

সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট ২০০১।

স্বামী, গম্ভীরানন্দ, *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* (সপ্তম সংস্করণ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২।

সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০১।

Gandhi, Mahatma, *Young India 1924-1926,* Current Thought *Press,* Triplicane, Madras, 1927.

Popenoe, David, Sociology. New Jersey Prentice-Hall, Englewood Cliffs: New Jersey, 1989.

Schaefer, Richar, *Sociology*: A Brief Introduction, McGraw-Hill; 5th edition, Boston, 2004.